আমাদের দুর্বলতা নিয়তি-নির্দিষ্ট নয়

অদীপ কুমার ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বসিরহাট কলেজ
ই-মেল ঃ adip.ghosh@basirhatcollege.org

একই সঙ্গে ভিতর ও বাইরে, দূর ও নিকটকে সমন্বিত করে দেখার ও দেখানোর ক্ষমতা যাঁদের থাকে তাঁরাই দ্রষ্টা, মনীষী; মহাকাব্য বাদে সাহিত্যের সব সংরূপেরই নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি, এই মনীষা বিশিষ্ট ও অনায়াস ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। বৃহত্তর অর্থে তাঁর স্বদেশ ও সমাজভাবনাও এই মনীষা-লালিত। মুক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কেও তিনি এক মহত্তর ও গভীরতর ভাবনারই আশ্রয়ে চিরায়ত ও বিশ্বজনীন সত্যেরই বার্তা দিতে চেয়েছেন; সুদীর্ঘ পথযাত্রার অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, দীর্ঘ-পরাধীনস্থ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনচেতনার সীমাবদ্ধতা। দীর্ঘকালের অবরুদ্ধ জীবনচর্য এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবার স্বপ্নটাকেও যখন সমূলে বিলুপ্ত করে তখনই তার নিত্য সংকট চূড়ান্ত আকার নেয়; তার মস্তিষ্ক, দৃষ্টি ,এমনকি তার অজৈবিক ক্রিয়াকর্মও নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রিক বা সনাতনী সামাজিক কিংবা সবলতর ব্যক্তির দ্বারা, যেখানে তার একান্ত নিজস্ব সত্তার বিপন্নকর অনুপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সঠিকভাবেই এই অনুপস্থিতির আপাত কারণ হিসেবে অতি সহিষ্ণুতাকেই দায়ী করেছেন। এখানে তিনি যেন অক্ষয় দত্তেরই উত্তরসূরী।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধটি শুরু করেছেন একটি নিতান্ত আঞ্চলিক সমস্যা (localised problem) দিয়ে;একই শহরে অবস্থিত হয়েও চিৎপুর ও চৌরঙ্গির আঞ্চলিক উন্নয়নের বৈষম্য ও তার কারণ ব্যাখ্যাই যেন এই রচনার প্রতিপাদ্য; কিন্তু এই বিষয়টিকে সামনে রেখে ক্রমশ তিনি যে পথে এগিয়ে গেলেন তা গোটা ভারতবর্ষেরই সমস্যা এবং তা বৃহত্তর অর্থে অবশ্যই রাজনৈতিক; তখন চিৎপুর আর চিৎপুরেই আটকে থাকেনি,তা একটি পরাধীন জাতির প্রতীক হয়ে উঠেছে, যে জাতি তার নিজের ভেতরকার শক্তিকে অনুভব করতে পারে না, অনুভবের উদ্যোগটাও হারিয়ে বসেছে। নীরবে অসহনীয়কে সহ্য করবার এই প্রবণতা যেন এক অনতিক্রম্য সংস্কারে পরিণত হয়েছে।এর ফলে এই সব মানুষেরা যন্ত্রণাময় স্থিতাবস্থাই চায়; পরিবর্তনে তার ভরসা নেই; পরন্তু ভেতর ভেতর তারা এতটাই দুর্বল যে, তারা কোনও রকম পরিবর্তনে আরও বেশি খারাপের আশঙ্কা করে। অগত্যা জলাশয়ে আবদ্ধ জীবনকেই অনিবার্য নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়। রবীন্দ্রনাথ শাণিত ভাষায় আমাদের এই আজন্ম শৃঙ্খলিত চরিত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বললেন,—

"আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্ম মাত্রই বুদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে,গণ্ডিকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না",--অর্থাৎ এই কর্তৃত্বের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বৃহতের যোগ,যার অনিবার্য ফসল আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং শক্তিবৃদ্ধি। এখানে সুকৌশলে যেভাবে তিনি আপাত সরল পরিবর্তনের কথা বলে বিপ্লবের তথা মহান পরিবর্তনের পটভূমি রচনার ইঙ্গিত রাখলেন তা এককথায় সব অর্থেই অনবদ্য।

অনিবার্যভাবেই এরপর 'অধিকার'প্রসঙ্গটি এসেছে। এর ব্যাখ্যাতেও তিনি যথারীতি অন্তর্ভেদী, তাই বললেন—-"মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার"। এই অধিকারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এখানে এক সামাজিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতার ইশারাও পাই ; এমনকি

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসেরও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সেখানে তীক্ষ্ণধী লেখক অনুপস্থিত রাখেননি। এজাতীয় লেখাগুলিতে যে ধরণের প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, তা রীতিমত বৈপ্লবিক ও আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখাতে চাইলেন,কর্তৃত্বের অধিকারই আসলে মনুষ্যত্বের অধিকার, এর মধ্য দিয়েই বৃহৎ জগতের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র গড়ে ওঠে; অথচ সনাতনী ভাবনায় আটকে থাকা দেশের মানুষকে নানাভাবে এই কর্তৃত্বের অধিকার থেকে ধর্ম ও সমাজ বঞ্চিত করে চলেছে ; জীবনের শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিয়ে তাদের অযোগ্যতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। যুগে যুগে নানা রূপে নানা পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষকে বদ্ধ কূপে আটকে রাখার সুকৌশল সক্রিয়। কখনও ধর্ম,কখনও রাজা বা জমিদার ,কখনও বা রাজনীতি নিজেদের স্বার্থে মানুষকে বৃহত্তর মঞ্চে প্রবেশাধিকার দেয়নি। তাদের নানা শাসন ও অনুশাসনে বেঁধে রেখে বারবার বোঝানো হয়েছে তারা নিতান্তই অপরিণতবুদ্ধি ;অধিকার লাভের যোগ্যই নয়, পরন্তু নিতান্তই করুণার পাত্র। এর সঙ্গে মহাউদ্যোগে অন্ধ সংস্কারও আমাদের সমাজের অগ্রসরণের প্রতিবন্ধকের ভূমিকা পালন করেছে, এই সত্য উচ্চারণ করতেও তিনি ভোলেননি বা দ্বিধাগ্রস্ত হননি।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, আত্মকর্তৃত্ব মানুষের ভেতর যে তীব্র সচলতা আনে, তারই জোরে সে এগোতে পারে; এই অভিযানের সূচনাপর্বে ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে,কিন্তু ভুলের মধ্যেই "ঠিক"-এর বীজ নিহিত থাকে; অথচ এই ভুলের দোহাই দিয়ে ঐসব নিয়ন্তা শক্তি মানুষকে স্বনির্ভর হতে দেয় না, ফলে সামগ্রিক বিচারে দেশ ও ব্যক্তির সত্যিকারের উন্নতি হয় না। ইংরেজদের শাসনপর্বেও এই একই অবস্থা।

এখান থেকে প্রবন্ধটিতে একটি নতুন মাত্রা খুব সূক্ষ্ম ভাবে যুক্ত হয়েছে। ইংরেজদের পদানত দেশের আন্তর্জাতিকবোধের কবি,স্বাধীনচেতা মানুষ রবীন্দ্রনাথ এদেশের শাসক ইংরেজদের সঙ্গে নীতিজ্ঞানসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক ইউরোপীয় সভ্যতার পার্থক্য চিহ্নিত করে প্রকৃতপক্ষে শাসকদের সমালোচনাই করেছেন ,--

"আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনো একটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্মকেই ভুলিয়া যায়--যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায় রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেস্টিজ রক্ষাকে তার চেয়ে বড়ো মনে করে--এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আগুমানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়"।

এই সমালোচনায় দুটি বার্তা খুব পরিষ্কার; প্রথমত, পাশ্চাত্যের স্বধর্ম বলতে গতিশীল সভ্যতার মুক্ত মানসিকতা ও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদের সাহায্যে মানবকল্যাণের ধর্মকেই বোঝানো হয়েছে; দ্বিতীয়ত, এই ধর্ম থেকে ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসক ইংরেজদের চরম বিচ্যুতি ; এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও সুকৌশলে প্রাবন্ধিক এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের জানান; বিষয়টি হল, সেসময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা শাসক ইংরেজদের বিপন্ন করে তুলেছিল বলেই তাদের শাসনে দমন-পীড়ন নীতিই মুখ্য কর্তব্য হয়ে উঠেছিল।বলা বাহুল্য, শাসকের এই বিপন্নতা যে তাদের অস্তিত্বেরই সংকট থেকে জন্ম নেয় তা চিরকালেরই ঐতিহাসিক সত্য। প্রসঙ্গত, একসময়ের ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের অন্যায় প্রকাশের দৃষ্টান্ত এনে প্রাবন্ধিক এই প্রবণতাকে অন্ধ শক্তিরই প্রকাশ বলে মনে করেছেন। অবশ্য দেশের এই অবস্থা যে ইংরেজরাই আমদানি করেছে, তা নয়; যুগ যুগ ধরে ভারতে রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বের অধিকার থেকে দেশের বৃহত্তর অংশ বঞ্চিতই থেকে গেছে; একথা না মেনে উপায় নেই যে দোষটা শুধু একপক্ষের নয়। বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীরব থাকা ও কর্তৃত্বের ভার না নেওয়ার প্রবণতাও মানুষকে সর্বত্রই পিছিয়ে দেয়; রবীন্দ্রনাথ জাতির এই দুর্বলতার কথা অন্যত্রও বলেছেন। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হাতের উপযোগিতা বোঝা সম্ভব নয়। যে জাতি এই সত্য অনুভব করে, তারাই বৃহত্তর মুক্তি ও প্রকৃত উন্নয়নের পথের পথিক হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যেহেতু ব্যক্তিগত, অঞ্চলগত সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, সেহেতু

এই কাজের দায়ভারের সঙ্গে আত্মিকভাবে যুক্ত হতে পারলে শুধু অধিকার অর্জনই নয়, মানুষের মনের আয়তনও প্রসারিত হয় — এই সত্যকে অস্বীকারের উপায় নেই; অথচ আমরা সবকাজেই মাথার উপর একটা ছাতার অস্তিত্ব প্রার্থনা করি। এর ফলে আমাদের স্বতোস্ফূর্ত ভাবে কোনো কাজের উদ্যোগ নেই, কর্তার ইচ্ছার ওপরই আমাদের যাবতীয় সক্রীয়তা। অনন্য মেধাশক্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে আমাদের পিছনে পড়ে থাকার দ্বিমুখী কারণ উপলব্ধি করেছেন।

এরপর প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ আলোচনার পরিধি আরও প্রসারিত করে স্বদেশীয় দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁর মতামতের সত্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধুকে ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কারণ হিসাবে মূলত তাঁর সচলতাকেই চিহ্নিত করেছেন। ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কারণ হিসেবে মূলত তার সচলতাকেই চিহ্নিত করেছেন। ইংল্যান্ডে ও স্পেনের সার্বিক অগ্রসরের পার্থক্যের কারণ এখানে যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তা তাঁর আন্তর্জাতিক সচেতনতা, গভীর ইতিহাস জ্ঞানেরই ফসল। তিনি দেখলেন, অন্যান্য দেশের মতো ইংল্যান্ডেও ''ধর্মতন্ত্র''-এর অবিসংবাদিত শাসন প্রচলিত ছিল; কিন্তু নিত্য সচলতার জন্যই সেই অবস্থা অতিক্রম করে সে আত্মকর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, যার ফলে সে আজ এত উন্নত ও সমৃদ্ধ; পক্ষান্তরে স্পেন প্রগতির পথে চলার সূচনাপর্বে উল্লেখযোগ্যতা দেখালেও স্বল্পদিনেই সেই গতি হারিয়ে ফেলল, শুধুমাত্র অচলতাকে আশ্রয়ের জন্য; ''ধর্মতন্ত্র''কে তার জীবনচর্যায় সে গৌণ করে তুলতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই অনিবার্যভাবে স্পেনের এই পশ্চাদপসারণ। ইংল্যান্ড থেকেও "ধর্মতন্ত্র" যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে, এমনটি নয়; কিন্তু তার অতীতের একচ্ছত্র আধিপত্য এখন প্রায় নেই বললেই হয়, অন্তত তা আর সমাজ-নিয়ন্তার ভূমিকায় অবস্থান করে না। ইংল্যান্ড কর্মক্ষেত্রে যেখানে নৈপুণ্যকে প্রাধান্য দিয়েছে। স্পেন সেখানে কৌলীন্যের পক্ষপাতী থেকে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের পার্থক্য কথাকোবিদের ভাষায় যে ব্যাখ্যা দিলেন তা প্রকৃতপক্ষে যেন ভারতাত্মারই উচ্চারণ। তাঁর মতে, ধর্মের মূল লক্ষ্য হল মানবকল্যাণ; এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রধান উপায় শ্রদ্ধাশীলতা আর এই শক্তিতেই মানুষ বৃহত্তর জগতের মুক্তির খোঁজ পায়; অথচ ধর্মতন্ত্র এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়, তা বৈষম্যবোধকেই উৎসাহিত করে। যা সারাক্ষণই আচার-বিচারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতেই তাকে আবদ্ধ রাখতে চায়, তাতেই তার মুক্তিলাভ সম্ভব বলে মনে করে। এই ধর্মতন্ত্রের প্রভাব ও স্বীকরণ যে সমাজে যত বেশি, সে সমাজের উন্নতিরও শম্বুক গতি। কবি-প্রাবন্ধিকের কাছে "ধর্ম" ও "ধর্মতন্ত্র" যথাক্রমে "আগুন" ও "ছাই", অর্থাৎ ছাইয়ের ভেতর যেমন আগুন থাকে না তেমনি "ধর্মতন্ত্র"-এর ভেতরে "ধর্ম"-এর করুণ অনুপস্থিতি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছেন তিনি। ফলত সেখানে মানবকল্যাণের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সারাজীবন যে মানবধর্মে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করে গেছেন তা এখানেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে।তাঁর মতে এই মানবধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যে ত্যাগের বীরত্ব ও নিষ্ঠার দরকার তা ভারতবর্ষের পূর্ণমাত্রাতেই ছিল, কিন্তু তা অপাত্রে দান করবার ফলে বিপরীত ফল ফলেছে। যে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে এ দেশের মানুষ "ধর্মতন্ত্র" রক্ষা করতে ব্যস্ত তা আদৌ ধর্মসঙ্গত নয়,পক্ষান্তরে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধর্মই;কারণ ক্ষুদ্র জাত-পাত, সম্প্রদায় কিংবা অর্থনৈতিক তারতম্যের জন্য মানুষকে অপমান করে কোনো পুণ্যই অর্জন করা সম্ভব নয়। ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এদেশের মানুষের অবস্থান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। নিবিড় নিষ্ঠায় সৌন্দর্য-সাধক, সমাজ-সচেতন লেখক এক বিশিষ্ট শোভা প্রত্যক্ষ করেছেন; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, মঙ্গলজনক কাজেই নিষ্ঠার শোভা, অন্যথায় তা নিতান্তই শ্রম ও মেধার অপচয়। এ প্রসঙ্গে তিনি পৌরাণিক চরিত্র একলব্যর গুরুদক্ষিণা দানের অসারতার দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হিসেবে অর্পণে একলব্যের নিষ্ঠাকে তিনি সঙ্গত কারণেই মেনে নিতে পারেননি ;এই নিষ্ঠায় কোনো বৃহৎ মঙ্গল ছিল না;পরন্তু তা ছিল এক কূট ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। ধর্মতন্ত্রের প্রতি এজাতীয় নিষ্ঠা তাই দেশের বা দশের পক্ষে নিষ্ফলই শুধু নয়,তা

অমঙ্গলজনক।

স্বদেশের দুর্বলতার দিকগুলি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ খুব পরিকল্পিতভাবেই বিষয়ান্তরে গিয়ে এবার দেশের শাসককুলের শাসনপদ্ধতির দিকে সমালোচনার আঙুল তুলেছেন। এখানেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও রাজনীতিবোধের পরিচয় খুব উজ্জ্বল। ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রতন্ত্রের মূলনীতির প্রশংসা করে তিনি এদেশের শাসক ইংরেজদের রাষ্ট্রনীতির কঠিন সমালোচনা করেছেন। ইংল্যান্ড যেখানে রাষ্ট্রিক দিক থেকে প্রজাদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির ঘোর বিরোধী, সেখানে এদেশের শাসক ইংরেজদের ভারতীয় প্রজাদের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে, বিশেষত জ্ঞানার্জনের আঙিনায় বৈষম্যমূলক দৃষ্টি ও আচরণকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের এই দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে মানবতাবাদী লেখক মনুষ্যত্বের অপমান লক্ষ করেছেন। তীব্র ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত আক্রমণ করে বলেছেন,পারমার্থিক দিক থেকে নীতির কথা স্বীকার করলেও এই ইংরেজরা ব্যবহারিক দিকে এই নীতিনিষ্ঠার গুরুত্ব স্বীকার করেন না; হয়তো এই অস্বীকারের গভীরে শাসকের বিশেষ আতঙ্কই সক্রিয় — এমন ইঙ্গিতও এখানে মেলে; কিন্তু মুশকিল হল, ইংরেজদের এই নীতিভ্রষ্টতা তেমন প্রকটভাবে সর্বসমক্ষে প্রচারিত হয়নি। যার ফলে আন্তর্জাতিকভাবে তা প্রতিষ্ঠা পায়নি। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার ফিরে এসেছেন ভারতীয়দের আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবে প্রতিবাদহীনতার প্রসঙ্গে। অবিচার-অত্যাচারের সত্যতা তখনই প্রতিষ্ঠা পায় যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তীব্র আকার নেয়। এই ব্যাপারটা স্বদেশীয়দের মধ্যে গড়ে ওঠেনি, মূলত সুদীর্ঘ কালের কর্তাভজা মানসিকতার জন্য,যার জন্য দায়ী ধর্মতন্ত্রের প্রতি আমাদের অতিরিক্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্যের প্রবণতা। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই সব কথাবার্তার মধ্যে যে অতি সূক্ষ্মভাবে রীতিমতো শাসক-বিরোধী আন্দোলনের তথা বিপ্লবের উদ্দীপ্ত আহ্বান আছে, তা সম্ভবত শাসকদেরও বোধগম্য হয়নি, অন্যথায় কবির এজাতীয় অনেক প্রবন্ধই নিষিদ্ধ হতে পারত। আসলে মনে হয় এমন দার্শনিক মোড়কে রবীন্দ্রনাথ এসব বৈপ্লবিক বাণী উচ্চারণ করেছেন, সৌভাগ্যবশত তৎকালীন শাসককুল নিজেদের সীমাবদ্ধতার কারণে এসব রক্তচক্ষুতে দেখতে পায়নি; এর উল্টোদিকটাও স্বীকার করতে হবে, সেটা অবশ্য দুর্ভাগ্যের ;অধিকাংশ স্বদেশীয়রাও ঐ একই কারণে তাঁর এই গূঢ়, ব্যঞ্জনাময় আহ্বান আত্মস্থ করতে পারেনি।

এই মহতী বিপ্লবের ইঙ্গিতময় আহ্বানই শুধু নয়,তার ক্ষেত্র রচনার সূত্রটিও তিনি এরপর ঐ একই ভঙ্গিতে বলে দিয়েছেন; সূত্রটি হল,ধর্ম,অঞ্চল,ভাষা নির্বিশেষে ভারতবাসীর পারস্পরিক সার্বিক যোগসূত্র গড়ে তোলা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রচনা করা। বলা বাহুল্য, এর মধ্য দিয়ে আমাদের শক্তি যে বৃহৎ সংহত রূপ পরিগ্রহ করবে, সেটিই শাসকের অত্যাচারকে,মানবতার নিত্য অপমানের যথাযথ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে — এই বিশ্বাসের উৎসমূলে সমাজবাদী চেতনার অস্তিত্ব অনুভব করা বোধ হয় কষ্টকল্পনা নয়।

এই পর্বে এসে আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ বাংলার যুবশক্তির ওপর ভরসা রেখেছেন। বিশ্বজগৎ থেকে জ্ঞানশক্তি আহরণ করে অদূর ভবিষ্যতে যুবকেরাই দেশের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে বৃহৎ মুক্তির পথ রচনা করবে বলে বিশ্বাস করেছেন। যদিও একেবারে প্রান্তিক পর্বে তাঁর ঔপনিষদিক চেতনায় সেই বিশ্বাস অর্পণ করে "আত্মানং বিদ্ধি"র মন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন। গভীর প্রত্যয়ে বলেছেন, যাবতীয় তামসিক অশুচিতার প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন আদর্শের অনুসারী হয়ে সর্বজনীন মানবতাকেই জয়ী করবে।

অন্যান্য প্রবন্ধের মতই এই প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সহজ গদ্যে নানা দৃষ্টান্ত এনে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন; এ কারণে একই প্রসঙ্গ ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনায় এসেছে। তবে এই রচনাটি একই সঙ্গে বাস্তববাদী সামাজিক মানবিক ঔপনিষদিক স্বদেশপ্রেমিক এবং রাজনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথের এক সমন্বিত পরিচয় বহন করেছে।